মানবজাতির স্বত্ব এবং দায়ীত্ব

ও

বাঙ্গালীজাতির সেই দায়ীত্ব পালন।

শোভাবাজার ডিবেটীং ক্লবে

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

পঠিত।

শ্রীশিবদাস ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১১নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে সচিত্র রাজস্থান যন্ত্রে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩ সাল।

মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

শোভাবাজার ডিবেটিং ক্লবের তৃতীয় বার্ষিকী সাধারণ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আনুকূল্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

এতৎ প্রচারলব্ধ অর্থ শোভাবাজার বেনিভোলেণ্ট সোসাইটীর হস্তে অর্পিত হইবে।

কলিকাতা
শোভাবাজার রাজবাটী।
২০শে মে, ১৮৮৬।

প্রকাশক
শ্রীশিবদাস ঘোষ।
শোভাবাজার বেনিভোলেণ্ট
সোসাইটীর সহ-সম্পাদক।

সূচীপত্র।

২৪৩৬।

মানবজাতির স্বত্ব এবং দায়ীত্ব

ও

বাঙ্গালীজাতির সেই দায়ীত্ব পালন।

মনুষ্য।

মানবজাতির উৎপত্তি, সমাজ সংগঠন, এবং উন্নতির ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্তটী মৃত্তিকাগর্ভস্থ বীজের ন্যায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন—অজ্ঞাত। তবে এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে—এই বিজ্ঞানের রাজত্বে সেই ইতিবৃত্তের মূল তথ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে বিজ্ঞান আজিও একটা কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে মনুষ্যজাতি, সাধারণ জন্তুশ্রেণীর মধ্যেই গণ্য। তবে মনুষ্যজাতি ক্রমোন্নতিসাধক শক্তিসম্পন্ন বলিয়াই এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত জন্তুশ্রেণীকে পশ্চাতে রাখিয়া, সর্ব্বশ্রেষ্ঠাসন অধিকার করিয়া লইয়াছে। অধ্যাপক ডারউইন বলেন, যে মানবজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ বানর ছিলেন; আমরা সেই বানর-

দিগের বংশধর। বানর অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে বহু যুগের পর আমরা বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা বানরের বংশধর, একথাটা শুনিলে হাসি পায় বটে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বলিতেছে, যে ইহার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু আধুনিক প্রাণীতত্ত্ববিদ্ এবং বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের সহিত প্রাচীন এবং আধুনিক ঋষিদিগের এসম্বন্ধে মতের মিল দেখা যায় না।

চিন্তাশীল প্রাচীন ঋষিদিগের মত, যে পুরুষ প্রকৃতির প্রতিকৃতিস্বরূপে মানবমানবী সৃষ্ট। আধুনিক বিলাতী ঋষি চেলসির ভবিষ্যদ্বক্তা টমাস কার্লাইল বলেন, "এই অনন্ত বিশ্বসংসারে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তৎসমস্তই যদি মহান মহেশের প্রতিকৃতি বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে, আমি বলি, সেই সমস্ত প্রতিকৃতির মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি। প্রাচীন ইহুদীজাতির মধ্যে 'সেকিনা' অর্থাৎ জগদীশ্বরের দৃশ্যমান আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে বিখ্যাত সেণ্ট খৃষ্টোষ্টমের প্রসিদ্ধ উক্তি আপনারা অবগত থাকিতে পারেন, তিনি বলেন, 'মনুষ্যই ঈশ্বরের প্রকৃত আত্মপ্রকাশ।' বাস্তবিক তাহাই সত্য। এই উক্তি কেবল বৃথা কথার কথা নহে। ইহা প্রকৃত সত্য কথা। আমাদিগের অস্তিত্বজ্ঞাপক—আমাদিগের দেহাভ্যন্তরীণ বিচিত্র রহস্য—যাহা স্বতঃই বলিতেছে—'আমি', সেই আমি কি? তাহা স্বর্গীয় নিশ্বাস—তাহা মহান মহেশ্বর কর্ত্তৃক মনুষ্যে আত্মপ্রকাশ। এই দেহ—এই ইন্দ্রিয়জ্ঞানবুদ্ধি

প্রভৃতি—এই আমাদিগের জীবন—এই সমস্ত কি সেই নাম-বিহীন পরম পুরুষের আবরণ স্বরূপ নহে? সাধু নোভালিস কি বলেন?—তিনি বলেন যে, 'অনন্ত জগতে কেবল একটী মাত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত। সে মন্দিরটী কি?—মানবদেহ। সেই মহান আকৃতি নবদেহমন্দির অপেক্ষা পবিত্র মন্দির আর কিছুই নাই। আমরা যখন মনুষ্যের নিকট নতমস্তক হই, তখন তদ্দারাই সেই মনুষ্যে আত্মপ্রকাশকারী ঈশ্বরের পূজা করি। আমরা মনুষ্যদেহে হস্তার্পণ করিলে, স্বর্গকেই স্পর্শ করি।' একথাগুলি শুনিতে কেবল আলঙ্কারিক উক্তিস্রোত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যদি আমাদিগের বিশেষ চিন্তার মুখে এই কথাগুলি অর্জন করি, তাহা হইলে জানিতে পারি, যে একথাগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য স্বরূপ, এইরূপ কথার দ্বারাই প্রকৃত সত্য প্রকাশ পায়। আমরা—মনুষ্যজাতি, এই অনন্ত সৃষ্টিরূপ মহান রহস্যরাজির মধ্যে রহস্যস্বরূপ—জগদীশ্বরের মহান অজ্ঞেয় রহস্যস্বরূপ। আমরা এ রহস্যের মূল কিছুই বুঝিতে পারি না, এসম্বন্ধে কি বলিতে হয়, তাহাও জানি না, কিন্তু যদি আমরা ইচ্ছা করি, তাহা হইলে অবশ্যই উক্ত তথ্য প্রকৃত সত্য বলিয়া অনুভব করিতে ও জানিতে পারি।"

বিজ্ঞানবিদ্দিগের সহিত ঋষি কার্লাইলের মতের মিল নাই, ইহা বেশ জানা গেল। এই মতভেদের এইমাত্র কারণ বলিয়া অনুভব হয়, যে বিজ্ঞানবিদ্ কেবল বিয়োগের

চক্ষে এই অনন্ত বিশ্বের প্রতি—অনন্ত বিশ্বের প্রত্যেক দৃশ্যমান পদার্থের প্রতি দৃষ্টি দিতেছেন, ব্যবচ্ছেদ, বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকৃতিকে—প্রত্যেক পদার্থকে তন্ন তন্ন—খণ্ড বিখণ্ড—ছিন্ন বিচ্ছিন্ন—চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, পাইয়াছেন কেবল পরমাণু' পরমাণুর পর এপর্য্যন্ত আর কিছুই পান নাই। সমস্ত খুঁজিয়া পাতিয়া এত শ্রমের পর পরমাণু কি, কোথা হইতে আসিল, কে আনিল, কে সৃষ্টি করিল, কিসে হইল, ইহা সিদ্ধান্ত করিতে এখনও পারেন নাই। কোন পদার্থেই তাঁহারা সৌন্দর্য্য দেখিতে পান না। কোন পদার্থেই তাঁহারা মহান মহেশের সেই প্রেমমাখা মুখখানি—সেই মহান অনন্তজ্যোতিঃ দেখিতে পান না। কেবল দেখেন—অজ্ঞাত—অজ্ঞেয় শক্তি। কিন্তু কার্লাইল প্রভৃতির ন্যায় প্রচীন এবং আধুনিক ঋষিগণ যোগের চক্ষে জগতের প্রতি দৃষ্টি দেন, আধ্যাত্মিক প্রেমপূর্ণ জ্ঞানবলে দৃশ্যমান প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে—এমন কি সামান্য ধূলিকণার ভিতরেও তাঁহারা অভ্রভেদী হিমালয় অপেক্ষাও মহান ভাব—মহান শক্তি দেখিতে পান। শারদীয় নির্ম্মল নীলিম নৈশাকাশে পূর্ণচন্দ্র প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে, সেই হাসির সঙ্গে নক্ষত্ররাজি হাসিতেছে, ভূধর হাসিতেছে, সাগর হাসিতেছে, সমগ্র সৃষ্টি হাসিতেছে, অনন্ত কিরণরাজি হাসিয়া, হাসিয়া অনন্ত বিশ্বে গড়াইয়া পড়িতেছে, কার্লাইলের ন্যায় ঋষি—ঈশ্বরপ্রেমিক সাধু সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে প্রাণে হাসিতেছেন—সেই স্বর্গীয় হাসির তরঙ্গ তাঁহার প্রাণে প্রাণে

অনুপ্রাণিত হইতেছে,সেই হাসিবাশির মধ্যে তিনি সেই মহান মহেশের হাসিমাখা মুখখানি দেখিতেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্ ? বিজ্ঞানবিদ্ দেঁতোহাসি হাসিয়া, বলিতেছেন, 'এত হাসিব চডাছড়ি কিসেব ? চাঁদত একটা গ্রহমাত্র ; কেবল সূর্য্যেব কিরণ হরণ করিয়া, তাই আবার বর্ষণ করিতেছে, এতে আবাব হাসির কথা কি ? এ আবার আশ্চর্য্য কি ? এতে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য কি ?' আমি বলি, এইরূপে দুইশ্রেণী দুই চক্ষে দেখেন বলিয়াই মতভেদ।

মানবজাতিব শ্রেষ্ঠতাব কাবণ।

দুইশ্রেণীর মধ্যে যতই কেন মতভেদ থাকুক না, মনুষ্যজাতি যে জীবশ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই। একমাত্র কার্য্যসাধক বিবেকবুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন বলিযাই মানবজাতি এই শ্রেষ্ঠতা অধিকার কবিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতার উৎকর্ষ সাধন কবিতেছে। সেই কার্য্যসাধক বিবেকবুদ্ধিজ্ঞানটী মাধ্যাকর্ষণী শক্তিস্বরূপ। মাধ্যাকর্ষণী শক্তি যেরূপ এই অনন্ত বিশ্বেব অনন্ত গ্রহনক্ষত্রকে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত করিয়া অনন্ত বিশ্বেব কার্য্য চালাইতেছে, সেই মাধ্যাকর্ষণী শক্তি যেমন কোন একটীমাত্র গ্রহবিশেষ হইতে উৎপন্ন নহে বা কোন একটীমাত্র গ্রহেব শক্তিস্বরূপ নহে, সেইমত কার্য্যসাধক বিবেকবুদ্ধিজ্ঞান আমাদিগের মনবাজ্যের ক্রিয়া সাধন কবিতেছে, মনের সকল বৃত্তিকেই যথাযথ স্থানে রাখিয়া—সকলগুলিকে সকলগুলির অধীনে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তভাবে

রাখিয়া, সকলগুলিকে যেন একটী সূত্রে বাঁধিয়া কার্য্য চালাইতেছে। মাধ্যাকর্ষণী শক্তি যেমন কোন একটী গ্রহজাত নহে, কার্য্যসাধক বিবেকবুদ্ধিজ্ঞানও সেইমত মনের কোন একটী বৃত্তি হইতে উৎপন্ন নহে, সেটী মনের সমস্ত বৃত্তির একত্র সংমিলনজাত ক্রিয়া সাধক। সেই কার্য্যসাধক বিবেকবুদ্ধিজ্ঞান অনুদিনই আমাদিগকে স্মরণ করিয়া দিতেছে, যে আমরা কে? আমরা কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি? আমাদিগের কি কি কাজ করিবার শক্তি আছে? আমাদিগের স্বত্ব কি? আমাদিগের দায়ীত্ব কি? এবং আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি? সেই কার্য্যসাধক বিবেকবুদ্ধিজ্ঞানই মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্তির একমাত্র মূল। সেই কার্য্যসাধক বিবেকবুদ্ধিজ্ঞান মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন জীব জন্তুর নাই। নাই বলিয়াই তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

আমরা যেমন কার্য্যসাধক বিবেকবুদ্ধিজ্ঞান পাইয়াছি, সেইমত সেই সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি গুরুতর দায়ীত্বভার আমাদিগের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। কতকগুলি সাধারণ দায়ীত্ব জীবজন্তু মাত্রেরই আছে, কিন্তু মনুষ্যজাতির পক্ষে সেই সাধারণ দায়ীত্ব ব্যতীত আরও অনেকগুলি এরূপ দায়ীত্ব আছে, যাহা অন্য জীবজন্তুর নাই। সেই দায়ীত্বগুলি পালন করাই মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা এজগতে মানবমানবী ব্যতীত দানবদানবী, দেবদেবীর কথা শুনিতে পাই। কিন্তু আমি বলি যে, দানবদানবীর জন্ম

স্বতন্ত্র জগত বা দেবদেবীর জন্য স্বতন্ত্র স্বর্গ নাই। এই জগতই মানবমানবী, দানবদানবী, এবং দেবদেবীর আশ্রম। জীবজন্তু মাত্রেরই যে কতকগুলি সাধারণ সহজ দায়ীত্ব আছে, যে কেবল সেই জন্তুর ন্যায় সাধারণ সহজ দায়ীত্ব পালন করিয়াই ক্ষান্ত, সে নরদেহধারী হইলেও জন্তু—মানব নহে। আর যে সেই সাধারণ সহজ দায়ীত্বের মস্তকে পদাঘাত করে, সে মানবাকৃতিবিশিষ্ট হইয়া, মানব-সমাজে থাকিলেও সে দানব। যে সেই সাধারণ দায়ীত্ব ব্যতীত গুরুতর দায়ীত্ব গুলির মধ্যে অধিকাংশ পালন করে,সেই-ই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই-ই মানব। আর যে মানব, সমগ্র গুরুতর দায়ীত্ব পালন করেন, তিনিই এজগতে দৃশ্যমান পূজ্য দেবতা। দুঃখের বিষয় সেরূপ দেবতা এজগতে বড়ই দুলভ।

আত্মার নিকট দায়ীত্ব।

এখন দায়ীত্বের কথা বলা যাউক। প্রথম—আত্মার নিকট মনুষ্যের দায়ীত্ব। কেহ পূর্ব্বজন্ম বা পরজন্ম মানুন বা না মানুন, জীব স্বীয় কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ ভোগ করে, ইহাও স্বীকার করুন বা না করুন, আত্মার উন্নতি, আত্মার পবিত্রতা এবং আত্মার সন্তোষ ও শান্তিসাধন কিন্তু সকল মতবাদীরই প্রার্থনীয়। কিন্তু যাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের নিকট আমার কিছুই বক্তব্য নাই। যাহা হউক কার্য্যসাধক বিবেকবুদ্ধিজ্ঞান সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে আত্মার দায়ীত্ব পালন করিতে বলিতেছে। আত্মার জন্য মনুষ্য

পবিত্রতা, সন্তোষ এবং শান্তি সংগ্রহ করিতে সর্ব্বদা বাধ্য। ঋষিদিগের মত আমাদিগের আত্মা, পরমাত্মার অংশস্বরূপ। আমাদিগের দেহমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতা সেই আত্মা। সেই আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারি-লেই মনুষ্যের আত্মার নিকট দায়ীত্ব পালন করা হয়। পবিত্রতা রক্ষা না করিতে পারিলেই মনুষ্য পিশাচে পরিণত হয়। সেই আত্মার তুষ্টিতে জগৎ তুষ্ট, এবং জগতের তুষ্টিতে সেই মহান মহেশ্বর তুষ্ট হয়েন। সেই আত্মার পবিত্রতা এবং তুষ্টি সাধন করিতে পারিলে সহজেই শান্তি আসিয়া দেখা দেয়। শান্তি আসিয়া, আত্মার সহিত পরমাত্মার অচ্ছেদ্য সংযোগ সাধন করিয়া দেয়। সেই শান্তিতে—সেই সংযোগেই জীবের মুক্তি।

যে মানব আত্মার দায়ীত্ব পালন করিতে সক্ষম হয়, সে সহজেই অন্যান্য সমস্ত দায়ীত্ব পালন করিতে পারে। আত্মার দায়ীত্ব পালনের প্রথম বিধান—সর্ব্বজীবে সমভাবে দৃষ্টি দান। যে মানব সেই সর্ব্বজীবে সমনেত্রে দৃষ্টি দান করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে কেবল আত্মার দায়ীত্ব পালনের পথ পরিষ্কার হয় না তাঁহার পক্ষে সকল দায়ীত্ব পালনই সহজ-সাধ্য হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য জগতে আজকাল সাম্যের বড়ই দোহাই পড়িয়াছে। সাম্যের ধ্বনি প্রতিধ্বনি সর্ব্বত্র ছুটি তেছে—ভারতবর্ষেও তাহার প্রতিঘাতধ্বনি আসিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের মুনিঋষিগণের সেই প্রাচীন সাম্যের সহিত

বিলাতী সাম্যের অনেক বিভিন্নতা আছে। বিলাতী সাম্য কেবল একদেশদর্শী—কেবল সকল মনুষ্যের সমান স্বত্ব, স্বাধীনতা এবং অধিকার ঘোষণা করিতেছে, সকল জীবে নহে। আবার যাহা ঘোষণা করিতেছে, তাহাও মুখে, কার্য্যে নহে। যেখানে যেখানে কার্য্যে করিতেছে, সেখানে সেখানে সার্ব্বভৌমিক সাম্য নহে—কেবল স্বজাতিগত সাম্যের দোহাই দিতেছে। সেই স্বজাতিগত সাম্যও আবার আজি পর্য্যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, আজিও বৈষম্য বিরাজমান। সাম্য-স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র সৌবিকিরিটীনী ইংল্যাণ্ড, সাম্যের কি ব্যাখ্যা করিতেছে? ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস, এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি দান করিলে আমরা কি দেখি? যে খাঁটী ইংরাজজাতির মধ্যে যে সাম্য দেখি, ইংরাজ এবং স্কচের মধ্যে সে সাম্য নাই। আবার ইংরাজ এবং স্কচের মধ্যে যে সাম্য আছে, আয়ার্ল্যাণ্ডে তাহার কিছুই নাই—সেখানে বৈষম্যের রাজত্ব। সেই বৈষম্য দূর করিবার জন্য আইরিসজাতি একজন মনুষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান, আর এক দিকে ইংরাজজাতির পাশবিক বল, সাম্যের মস্তকে পদাঘাত করিতে নিযুক্ত। বৃদ্ধ মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন, সেই বৈষম্য কতক পরিমাণে দূর করিতে অগ্রসর হওয়ায় সমস্ত ইংরাজজাতি—এমন কি যে র‍্যাডিকালগণ সাম্যের প্রধান উপাসক সেই র‍্যাডিকালগণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনকে—যাঁহার নামে আজি ইংরাজজাতি গৌরবান্বিত—সেই গ্লাডষ্টোনকে একঘরে

করিয়া ফেলিয়াছেন। সাম্যের লীলাক্ষেত্রে এই বৈষম্যের পূজা—বৈষম্যের এত আদর। আর এক দৃষ্টান্ত—গ্রেট-ব্রিটেন এবং আয়ার্লণ্ডের সহিত ব্রিটিস উপনিবেশ সমূহের তুলনা কর, সাম্যের আর একমূর্ত্তি দেখিবে। আবার সেই উপনিবেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের তুলনা কর, আর এক দৃশ্য দেখিবে। ভারতবর্ষ, ব্রিটিস রাজমুকুটের সমুজ্জ্বল মণি। ইংরাজ, মুখে স্বীকার করুন বা না করুন, তাঁহাদিগের হৃদয় বলিতেছে, ভারতবর্ষের বলেই ইংরাজ বলী, ভারত অধিকার সূত্রেই ক্ষুদ্র দ্বীপ ইংলণ্ড আজি সমগ্র জগতে গৌরবান্বিত। কিন্তু ভারতে সেই ইংরাজ-পূজিত সাম্য কোথায়? হিমালয় হইতে কন্যা কুমারী—কোয়েটা হইতে ভামো পর্য্যন্ত দেখ, কেবল বৈষম্যের রাজত্ব। দেখিবে বৈষম্যের বিষম বহ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে,—সমস্ত ছারখার করিতেছে, ভারতকে অনন্ত শ্মশানে পরিণত করিতেছে। হিন্দুতে মুসলমানে, পারসীতে মহারাষ্ট্রে, রাজপুতে বাঙ্গালীতে যাহাতে মিশ না খায়—যাহাতে সাম্য স্থান না পায়, দেখিবে, ইংরাজের কেবল সেই চেষ্টা। তাই বলি বিলাতী সাম্যে এবং আমাদিগের মুনিঋষিদিগের মতানুযায়ী সর্ব্বজীবে সমভাবে দৃষ্টিদানে অনেক বিভিন্নতা আছে। মানব যখন যোগে মগ্ন হইয়া জ্ঞানবলে সমগ্র বিশ্বে—অত্যুচ্চ হিমালয় হইতে সামান্য পরমাণু পর্য্যন্তে ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখিবে, যখন প্রত্যেক পদার্থে তন্ময় জ্ঞান জন্মিবে, তখনই সে সর্ব্বজীবে সমভাবে দৃষ্টি দান

করিবে। তখন তাহার নিকট আর ভেদ কিছুই থাকিবে না। তখনই প্রকৃত সাম্যের পূজা হইবে। বৈষম্য কি তাহা তখন সে ভুলিয়া যাইবে। তখন আত্মার দায়ীত্ব প্রকৃতরূপে পালিত হইবে। অনেকেই বলিতে পারেন যে, সংসারির পক্ষে সেই তন্ময়দৃষ্টিজ্ঞান লাভ অসম্ভব। সেটা বড় ভুল। সকল আশ্রম অপেক্ষা সংসার-আশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সংসারাশ্রমে থাকিয়া মনুষ্য যেরূপ সকল দায়ীত্ব পালন করিতে পারে, সংসারবিরাগী যোগী যেরূপ কখনই পারেন না। তবে মানবজাতির বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে বর্ত্তমানে সংসারে থাকিয়া সকলের পক্ষে সেই জ্ঞানলাভ অবশ্যই সহজসাধ্য নহে।

আত্মার সেই দায়ীত্ব পালনের দুটী উপায়—ধর্ম্ম এবং নীতি। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি ধর্ম্মের কয়েকটী লক্ষণ এবং সত্য ও ন্যায়ের সম্মান রক্ষা, মিথ্যাকথা, পরদ্রব্য হরণ, পরের অনিষ্টসাধন গর্হিত প্রভৃতি যে কয়টী বিধান আছে, তাহা কেবল হিন্দুধর্ম্মে নহে, মুসলধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেই দেখিতে পাই। ধর্ম্মের মৌলিক নীতি সকল ধর্ম্মেরই এক, কেবল অনুষ্ঠান পদ্ধতি এবং ব্যবস্থা বিভিন্ন। এখনকার যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত ঈশ্বরকে উড়াইয়া দিতেছেন, তাঁহারাও কোন এক ধর্ম্ম না মানুন, ধর্ম্মের লক্ষণ এবং বিধিগুলি অন্ততঃ অলক্ষ্যে পালন করিতে ক্ষান্ত নহেন।

যখন সকল ধর্ম্মের সকল লোকেরই মুক্তি আছে, তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনুষ্য মাত্রকেই স্বাধীনতা দেওয়া ন্যায়ের আদেশ। এখন খৃষ্টান পিতা মাতা, আঁতুড়ঘরেই জর্ডানের জলে পুত্র কন্যাকে পবিত্র করিয়া তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মুসলমান এবং হিন্দুজাতিও শৈশব হইতে পুত্র কন্যাদিগকে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কিন্তু তাহা অন্যায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যখন শিশুর কোন জ্ঞান নাই, তখন পিতামাতা তাহাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে বাধ্য, কিন্তু তাহাকে পিতামাতার ইচ্ছানুসারে দীক্ষিত করা অবশ্যই অন্যায়। পুত্র কন্যা জ্ঞানলাভ করিয়া, শিক্ষালাভ করিয়া, যে ধর্ম্মে তাহার বিশ্বাস জন্মিবে, সেই ধর্ম্মই তাহাকে অবলম্বন করিতে দেওয়াই বিহিত। ঘোর তান্ত্রিক—ঘোর শাক্তের পুত্র যদি বৈষ্ণব হইতে চায়, হউক, তাহাকে বলপূর্ব্বক তান্ত্রিক বা শাক্ত করা কি ন্যায়সঙ্গত? খৃষ্টানের পুত্র যদি খৃষ্টকে ত্রাণকর্ত্তার পরিবর্ত্তে কেবল মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়া, কেবল একমাত্র ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিতে চায়, তাহাকে তাহাই করিতে দেওয়া বিহিত। এখনকার শিক্ষিত হিন্দু যুবক, যদি মাকালপূজা, ষষ্টিপূজা, ঘেঁটুপূজা বা প্রতিমাপূজার নূতন রকমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তৃপ্ত না হইয়া, প্রাচীন মুনিঋষিদিগের ন্যায় একমাত্র ঈশ্বরের পূজা করিতে চায়, তাহাই তাহাদিগকে করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূলভিত্তি, অটল বিশ্বাসেই মুক্তি। যাহার যাহাতে বিশ্বাস,

তাহাকে সেই ধর্ম্মই পালন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহার যাহাতে বিশ্বাস নাই, গুরুজনগণ বা সমাজ বলপূর্ব্বক তাহাকে সেই ধর্ম্মে বাঁধিয়া রাখিলে মঙ্গল কোথায়? ইহাতে তাহারও মুক্তি নাই, সমাজেরও মঙ্গল নাই। কেবল ভণ্ড-সংখ্যা বাড়িবে মাত্র।

ধর্ম্মের ন্যায় নীতিও মনুষ্যের প্রধান বল। নীতিহীন মনুষ্য পশুর তুল্য। নৈতিক বলে বলীয়ান মনুষ্যের সমাদর সর্ব্বত্র সমান। নৈতিক বল কেবল ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত মহত্ত্বও বৃদ্ধি করে। যে জাতি নৈতিক বলে যত বলীয়ান, সেই জাতির উন্নতি, স্থায়ীত্ব ততই প্রবল এবং গৌরব ততই অগ্রগামী। অনেকে পাশবিক বলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, কিন্তু পাশবিক বল প্রথমে জয়লাভ করিলেও শেষ অবশ্যই নৈতিক বলের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। মুসলমানেরা পাশবিক বলে ভারত অধিকার করিয়াছিলেন; তখন ভারতের নৈতিকবল বড়ই দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল, মুসলমানদিগের জয় হইল। ধর্ম্ম এবং নৈতিক বলে বলীয়ান যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে পাশবিক বলে বলী যবন বসিল। কিন্তু মুসলমানদিগের সেই পাশবিক বল ক্ষীণ না হইতে হইতেই চিরস্মরণীয় আকবর নৈতিক বলের পূজা আরম্ভ করিলেন। মুসলমান শাসনশক্তি আবার অন্য উপায়ে দৃঢ় হইয়া পড়িল। তখন হিন্দু 'দীল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' ধুয়া ধরিল। আকবরের মহিমা হিন্দুর ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। আক-

ববের স্বর্গগমনের সঙ্গে সঙ্গে আবার নৈতিক বল চলিয়া গেল। দুর্দ্দান্ত আবঙ্গজেব আবার প্রচণ্ডবেগের সহিত পাশবিক বল প্রয়োগ করিলেন। চারিদিকে তাঁহার শাসনশক্তি বিস্তৃত হইল। কিন্তু তিনিও মরিলেন, পাশবিক বলও একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িল, ক্রমে ভারত হইতে মুসলমান শাসন শক্তি বিদূরিত হইয়া যাইল। আবঙ্গজেব নৈতিক বলে বলীয়ান হইলে তাহা হইত না। লর্ড লিটন, পাশবিক বলে ভারতের ঘরে ঘরে আগুণ জ্বালিয়া দিয়াছিলেন, চারিদিকে অসন্তোষ-স্রোত বহিয়াছিল, ইংরাজশাসনের প্রতি ভারতীয়গণের বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়াছিল, কিন্তু ভারতের প্রকৃত হিতৈষী লর্ড রিপণ—নৈতিক বলের পূজক লর্ড রিপণ—আমাদিগের লর্ড রিপন, সেই লিটন-প্রজ্বলিত অনলে নৈতিক বারি বর্ষণ করিলেন, ইংরাজ-শাসনের নিকট আবার ভারতীয়গণের হৃদয় কৃতজ্ঞ হইল। হিমালয় হইতে ভারতসাগর পর্য্যন্ত রাজভক্তিরূপ গঙ্গা আবার রঙ্গেভঙ্গে প্রবলতরঙ্গে প্রবাহিত হইল। নৈতিক বল, ইংরাজজাতিকে দেখাইয়া দিল, সে পাশবিক বল অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ।

যে জাতি যত দুর্ব্বল—যে জাতি যতই পরাধীন, পরপদদলিত, পরমুখাপেক্ষী, সে জাতির হৃদয় ততই দুর্ব্বল—ততই ক্ষীণ। সে জাতির একটা স্বাভাবিক তীব্রতেজ—স্বর্গীয়তেজ—জ্বলন্ত দীপ্তি প্রায় থাকে না। সে জাতি মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলে। সুসভ্য শিক্ষিত সবল স্বাধীন জাতি, বিবিধত্ব স্বাভা-

বিক তীব্রতেজ অক্ষত রাখিয়া, মনুষ্যত্ব পাইয়া, নৈতিক চরিত্র উৎকৃষ্ট করিতেই চেষ্টা পায়। সে জাতিব হৃদয় সবল—সাহসী। বালকেব বল-সম্বল—ক্রন্দন। দুর্ব্বলজাতির বল সম্বল—ক্রন্দন, প্রার্থনা আর ভিক্ষা। কেবল ক্রন্দন, প্রার্থনা আব ভিক্ষায় জাতিব জীবন চলে না। কাজেই দুর্ব্বলজাতি অন্য উপায় অবলম্বন কবে। অন্য উপায়ে স্বার্থ পূরণ কবিয়া লয়। যে জাতিব দেহ সবল, হৃদয় সবল, সে জাতি নির্ভয়ে দর্পের সহিত অগ্রসর হইয়া, সত্যের জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া, স্বীয় স্বার্থ পূবণ করিয়া লয়। আর দুর্ব্বলহৃদয় জাতি সেই ক্রন্দন, প্রার্থনা এব' ভিক্ষায় সফল না হইয়া, শেষে প্রবঞ্চনা, ফন্দী, ছলনা, মিথ্যাকথা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া স্বার্থ পূরণের চেষ্টা পায়। নীতির বাজারে সত্যের ব্যবসা কবিতেই মনুষ্যমাত্রে জগদীশ্বরেব দ্বারা আদিষ্ট। সত্যেব মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সত্যের ব্যবসা করিতে গেলে, সত্যরক্ষা করিবাব জন্য সবলহৃদয়ের প্রয়োজন। সত্যেব সম্মান রক্ষাব জন্য নির্ভয়ে অগ্রসর হইবাব প্রয়োজন। দুর্ব্বলহৃদয় জাতিব সে ক্ষমতা থাকে না। কাজেই সে জাতি, নীতির বাজারে নির্ভয়ে মিথ্যার বাজবা খুলিয়া বসে। সেই মিথ্যাকেই খাঁটী সত্য বলিয়া—খাঁটী মাল বলিয়া, ক্রেতাদিগের চক্ষে ধূলা দিয়া, সেই সব জাল জিনিস বিক্রয় করিয়া, যথালব্ধ অর্থে জীবন পোষণ করে। কিন্তু সেই জাল জিনিস বিক্রয় কবার কারণ পরিণামে যে তাহাকে উচিত দণ্ড পাইতে হইবে, ইহা

সে ভাবে না। ভবিষ্যতের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই—উদরের জ্বালায় আত্মস্বার্থ সাধন জন্য বর্ত্তমানের প্রতিই তাহার দৃষ্টি। আমাদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতার উপর হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, তাহার উপর আবার নীতিশিক্ষার অভাব। আগে আমরা পিতামাতার নিকট—ঠাকুর দাদার নিকট নীতিশিক্ষা পাইতাম, দেশের রাজা, প্রজাদিগের নৈতিক চরিত্রের উপরও দৃষ্টি রাখিতেন, এখন তাহার কিছুই নাই। এখন পুত্রের নীতি-শিক্ষার দিকে পিতামাতা ভুলেও দৃষ্টি দেন না। ছেলেটী যাহাতে ইংরাজি শিখিয়া দুপয়সা আনিতে পারে, ইহাই পিতামাতার চেষ্টা। পাঠশালায় গুরুমহাশয় চাণক্য শ্লোক পড়াইয়া নীতিকথার আলোচনা করেন বটে, কিন্তু আর একদিকে ছাত্রকে বাটী হইতে তামাকু চুরি করিয়া আনিবার আজ্ঞা দেন। না আনিলে ঠেঙ্গাইতে—নাড়ুগোপাল সাজাইতে আরম্ভ করেন! বিদ্যালয়ে পণ্ডিত বা মাষ্টার মহাশয় নিজে নীতির কোন ধার ধারেন না, নীতিশিক্ষার কোন ব্যবস্থাও নাই, ছাত্রের নৈতিক চরিত্রগঠনের দিকে কাজেই দৃষ্টি নাই। রাজা বিজাতীয় হইলেও শিক্ষিত সভ্য, কিন্তু রাজার প্রতিজ্ঞা ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে না। কাজেই বিশ্ববিদ্যা-লয়ে ঈশ্বরশূন্য শিক্ষার স্রোত বহিতেছে। কোন বিশেষ ধর্ম্মগ্রন্থ শিক্ষা নাই দাও, নীতিশিক্ষাও ত দিতে পার, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাও দিবেন না! কাজেই আমরা দুর্ব্বলদেহ—দুর্ব্বলহৃদয় হইলেও নীতিশিক্ষা দ্বারা যেটুকু

নৈতিকবল সঞ্চয় করিতে পারিতাম তাহাও পাইবার আশা নাই।

ছোট লাট সাঁর রিভার্স টমসন বাহাদুর, এখনকার ছেলে-দের উপর বড়ই নারাজ। তাহারা পিতামাতা গুরুজন-দিগকে মান্য করে না, দেখিলে প্রণাম নমস্কার করে না, তাহারা বড়ই উদ্ধত। এই জন্যই ঢাকা এবং কৃষ্ণনগরের পুলিশ, যখন দলে দলে ছেলেদের ধরিয়া হাজতে রাখে, ইংরাজ মেজিষ্ট্রেট ছেলেদের জেলে দেন, আর বহরমপুরের কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ লিভিংষ্টোন যখন ১০১ বেত্রাঘাত দণ্ডের ব্যবস্থা করেন, তখন ছোট লাট তাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু ছোট লাট একবার ভাবিয়াও দেখেন নাই, যে গবর্ণমেণ্টের দোষেই ছেলেরা এইরূপে ছেলেমি করিতেছে, উদ্ধতস্বভাব হইয়া মাতিয়া উঠিতেছে। তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই—এখনও দেখিতেছেন না, যে কেবলমাত্র নীতিশিক্ষার অভাবেই ইহা ঘটিতেছে। পুলিশের রুলের গুঁতায় বা জেলের ঘানিগাছে নীতিরূপ তৈল বাহির হয় না, গবর্ণমেণ্ট ইহা যতদিন না জানিবেন, ততদিন যুবক-দিগের নীতিশিক্ষার অভাব এইমতই থাকিয়া যাইবে।

আত্মার দায়ীত্বপালন জন্য ধর্ম্ম এবং নীতির সাহায্য গ্রহণ করিতে যদি সমগ্র মানবজাতি অন্তরের সহিত অগ্রসর হইত, তাহা হইলে, মানবজাতির স্কন্ধে অন্য কোন প্রকার দায়ীত্ব ভার অর্পিত হইত না, পৃথিবী শান্তিসলীলে পূত এবং স্বর্গীয়

সৌরভে আমোদিত হইতে পারিত। মনুষ্য আত্মার দায়ীত্ব পালনে বিমুখ বলিয়াই অপর কতকগুলি দায়ীত্ব আসিয়া অগত্যাই দেখা দিতেছে এবং সেই দায়ীত্বপালন জন্য মনুষ্যকে পাশবিক বল প্রভৃতির আশ্রয় লইতে হইতেছে।

শারীরিক দায়ীত্বপালন।

জীবসাধারণের পক্ষে শারীরিক দায়ীত্ব অবশ্য প্রতিপাল্য সহজ দায়ীত্ব। শরীরের দায়ীত্বপালন এবং শরীর রক্ষা না করিলেই জীব ইহজীবনে বিষময় ফল পায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, বাঙ্গালীজাতি এক্ষণে উন্নতিস্রোতে গা-ভাসান দিলেও শারীরিক দায়ীত্বপালনে বড়ই বিমুখ। শারীরিক বলই জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় মনুষ্যের স্বত্ব, অধিকার, এবং স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান উপায়। দুর্ব্বলের দুর্গতি চিরপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালীজাতি মানসিক বলে সকল জাতির সহিত সমকক্ষতা—স্থলবিশেষে শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইলেও শারীরিক বলে জগতের সকল জাতির পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ইহার কারণ শারীরিক দায়ীত্বপালনে পরাঙ্মুখতা। দেশের পরিবর্ত্তিত জল বায়ু, বা সামাজিক অনিষ্টকারক আচার ব্যবহার আমাদিগের যত না শারীরিক অনিষ্ট করিতেছে, আমরা নিজে ইচ্ছা করিয়া তদপেক্ষা সহস্রাংশে অনিষ্ট করিতেছি। একদিকে আমরা উচ্চশিক্ষা পাইয়া উন্নতির দিকে একপদ অগ্রসর হইতেছি, অন্যদিকে শারীরিক দুর্ব্ব-

লতা—শারীরিক শ্রমকাতরতা—শারীরিক বলসঞ্চয়ে অমনোযোগিতা এবং বিলাতী বিলাসিতা আমাদিগকে পাঁচ পা পেছনে ঠেলিয়া ফেলিতেছে। শারীরিক বল কেবল আত্মরক্ষার জন্য নহে, সমাজ, জাতি এবং জন্মভূমি রক্ষার জন্যও প্রয়োজন। মানসিক উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বল সঞ্চয়—শারীরিক শ্রম অবশ্য প্রয়োজনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা আর কিছু করুক না করুক, নব্য যুবকদিগের শরীরের সমস্ত রক্ত কেবল চুষিয়া খাইয়া, মাথার ভিতর খড়কুটা গুঁজিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণ এখন মাথার জ্বালায় আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পেটের জ্বালায় পাগল। আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনে—শিক্ষায় ভারতের অন্যান্য জাতিকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইলেও—আমরা ভারতের রাজনৈতিক নেতা উপাধি পাইলেও একমাত্র জাতিগত দুর্ব্বলতার কারণ আমাদিগের উন্নতিবিদ্বেষিগণ কি বলিতেছে? এই যে আজকাল বাঙ্গালার চারিদিকে অদৃষ্টপূর্ব্ব রাজনৈতিক আন্দোলনরূপ অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এই যে হাজার হাজার রায়ত, সভা করিয়া রাজনৈতিক শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণে অগ্রসর হইতেছে, এসকল দেখিয়া আমাদিগের চির-শক্ররা কি বলিতেছে? তাহারা বলিতেছে, হাজার হাজার বাঙ্গালী মিলিয়া সভা করে করুক—ভয় নাই, ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহাদিগের আদর্শে যেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সবল জাতিসমূহ এরূপ সভাসমিতি করিতে না শিখে। একথা

গুলিতে কি বুঝায়? এখন দশ বিশ হাজার বাঙ্গালী, সভা করিয়া একত্র জমা হইলে, আমাদিগকেই শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের সাহায্য চাহিতে হয়। সেই শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের ফী পর্য্যন্ত আমাদিগকে ঘর হইতে দিতে হয়। কিন্তু আজি যদি লাহোরে দশ হাজার শিখ, লক্ষ্ণৌয়ে দশ হাজার মুসলমান, আলাহাবাদে দশ হাজার হিন্দুস্থানী, পুনায় দশ হাজার মহারাষ্ট্র, আজমীরে দশ হাজার রাজপুত সমবেত হয়, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? পুলিশ কি তখন ফী না পাইলে যাইব না বলে?—তখন খোদ' মেজিষ্ট্রেট বাহাদুর মহা বিপদ গণিয়া রাজ্যের পুলিশ প্রহরী লইয়া শান্তিরক্ষার জন্য দৌড়ান। তারে তারে মিনিটে মিনিটে রাজপুরুষদিগের মধ্যে কত কি খবরাখবর চলে। ক্যান্টনমেণ্ট এবং কেল্লার সমস্ত ব্রিটিস সৈন্য তলোয়ার, বন্দুক, গুলিগোলা লইয়া প্রস্তুত থাকে, আর ইংলিশম্যান ও পাইওনিয়ার সম্পাদক তখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মূর্চ্ছা যান। কেন এদৃশ্য দেখিতে পাই? কারণ—তাহারা বলশালী জাতি।

শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য বাঙ্গালীজাতি জগতে কলঙ্কিত, পদে পদে বিদলিত, জগতের প্রত্যেক জাতির পশ্চাতে পতিত। শারীরিক দায়ীত্বপালন না করিতে শিখিলে, আমরা কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে কখনই জাতি নামে গণ্য হইতে পারিব না। ব্যায়াম চর্চ্চা, স্বাস্থ্যবিধান পালন, মানসিক শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রম

এবং বিলাসিতা পরিত্যাগ করা এক্ষণে একান্ত প্রার্থনীয় হইয়া উঠিয়াছে। অমিতাচার, কদাচার, এবং যে সকল সামাজিক প্রাচীন বিধি বর্ত্তমান সময়ের অনুপযোগী এবং আমাদিগের শারীরিক অনিষ্টকারক তৎসমস্ত পরিবর্জ্জন এবং সংশোধন প্রার্থনীয়। অনাচার, কদাচার এবং পানদোষ প্রভৃতি বিলাতী বিলাসিতা আমাদিগের দেহের—আমাদিগের দেশের যে সর্ব্বনাশ করিতেছে, সে গুলি আগে পরিহার করা বিহিত। আমরা তাহা না করিয়া বরং সেই বিলাতী বিলা-সিতাতে দিন দিন মাতিয়া উঠিতেছি। তাহাতে আমরাও অধঃপাতে যাইতেছি, সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশটাকেও নরকের দিকে লইয়া যাইতেছি।

আমাদিগের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বলিয়া থাকেন, যে আমরা কি দরোয়ানী করিব, তাই শারীরিক বলের প্রয়োজন? কিন্তু যখন রেলের গাড়ীতে, হাটে বাজারে মেলায় আর আফিষে প্রবলের গুঁতা ঘুসি খাইয়া গা ঝাড়িতে থাকি, তখন আপনাদিগকে কি পশু অপেক্ষাও অধম বোধ হয় না? তখন কি সেই প্রতিহিংসা আর বুকের ভিতরের বিষম জ্বালা বুকে চাপিয়া রাখিয়া, মনের দুঃখে হাত কামড়াই না? যদি সেই গুঁতার বদলে গুঁতা—সেই ঘুষির পরিবর্ত্তে ঘুষি দিতে পারিতাম, তাহা হইলে এতদিনে সেই সবলের গুঁতা ঘুষি কোথায় উড়িয়া যাইত। ঘুষির বদলে ঘুষি দিতে শিখ, কেবল ইংরাজ নহে, সকল জাতিই মনুষ্য বলিবে,

নতুবা পশু। আত্মধিক্কার—আত্ম অপমান বোধ না জন্মিলে সেই গুঁতার বদলে গুঁতা দিতে শিখিব না। পশু ভিন্ন এজগতে কাহার আত্মধিক্কার এবং আত্ম-অপমান বোধ নাই ?

আবার যতই আমরা বিলাতী সভ্যতা—বিলাতী বিলাসিতার অনুসরণ করিতেছি, ততই দুর্ব্বল, ততই দেহ ভগ্ন রুগ্ন হইয়া যাইতেছে। ততই আমাদের মধ্যে অকালমৃত্যু প্রবল হইতেছে। যে জাতি যতই বিলাসী, সেই জাতির পতন ততই নিকটবর্ত্তী। ইংরাজের ন্যায় প্রবল মানসিক শ্রম করিতে শিখিয়াছি, কিন্তু শারীরিক শ্রম করিতে শিখি নাই। সেইজন্য চিন্তাশীল কৃষ্ণদাসের অকালমৃত্যু, সেইজন্যই চিন্তাশীল কেশবচন্দ্রের অকালে স্বর্গারোহণ, সেইজন্য দ্বারকানাথ মিত্রের অকালে পরলোক প্রাপ্তি। সেইজন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই যৌবনে জরা দেখা যায়। মানসিক শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা শারীরিক শ্রম করিতে শিখিতাম, তাহা হইলে জননী বঙ্গভূমি অকালে উপযুক্ত পুত্রহীনা হইতেন না।

আমরা ইংরাজের সদ্‌গুণগুলি লইতে শিখি নাই, মন্দগুলি লইতেই আমাদিগের বাবু এবং বিবিদের যত্ন। শারীরিক শ্রমটা বাস্তবিকই আমরা দরোয়ান আর কুলীর পক্ষে দরকার জ্ঞান করি। বৃদ্ধ মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন, তিনি সাতাত্তরে বুড়ো, তিনি কেন কুঠার লইয়া বাগানের বড় বড় গাছ কাটেন ?—কেন ? -তাঁহার উদ্যানে কি মালী নাই ? বৃদ্ধ গ্লাডষ্টোন

রাজমন্ত্রীপদ গ্রহণ জন্য উইণ্ডসর রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে উইণ্ডসর প্রাসাদে পায়ে হাঁটিয়া গমন করেন। কেন? তাঁহার কি একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ীও জুটে না?—সংবাদপত্রে পড়িতে পাই, মন্ত্রীবর গ্লাডষ্টোন, লণ্ডনের রাজপথে হাঁটিয়া যাইতে যাইতে একজনকে গাড়ীচাপার মুখ হইতে রক্ষা করেন। গ্লাডষ্টোন এখন ইংরাজজাতির রাজা বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু কেন তাঁহাকে আমরা এত শারীরিক শ্রম করিতে দেখি? একা গ্লাডষ্টোন নহে, ইংরাজমাত্রেই শারীরিক দায়ীত্ব পালন করিতে—যথোচিত পরিশ্রম করিতে সবিশেষ যত্নবান। কিন্তু আমরা কি করি? এই নগরের রাজা মহারাজগণকে কি কেউ কখন রাজপথে তাঁহাদিগের ভবপারাবার পারকারণ চরণযুগল অর্পণ করিতে দেখিয়াছেন? তাঁহারা ক্ষীরসর ননীমাখন খাইয়া ভুঁড়ি বাড়াইতেছেন। তাহার ফল কি হইতেছে? ভৃত্য যতক্ষণ না স্নান করাইয়া দিবে, ততক্ষণ স্নান হইবে না, যতক্ষণ না একপাত্র তৃষ্ণার জল দিবে, ততক্ষণ তৃষ্ণা নিবৃত্তির উপায় নাই, যতক্ষণ না যুবরাজ অঙ্গদের লাঙ্গুলস্বরূপ আলবোলার নলটী মুখের কাছে তুলিয়া দিবে, ততক্ষণ ধূম্রপান হইবে না। কেবল তাঁহারা গোগ্রাসটী মুখে তুলিয়া লয়েন, বলা বাহুল্য যে, তাহাও অতি কষ্টে। তাহার জন্য ঈশ্বরকে অবশ্যই তাঁহারা অপরাধী জ্ঞান করেন। ধনীলোকদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও মধ্যশ্রেণীর লোকেরাও আজকাল ইংরাজি পড়িয়া, সভ্যতার দোহাই দিয়া বাবু হইয়া

পড়িতেছেন—গতরের মাথা খাইতেছেন। শারীরিক দায়ীত্ব-পালন না করিয়া আপনারাও মজিতেছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ছেলেপিলেদের আদর্শ দেখাইয়া মজাইতেছেন।

পারিবারিক দায়ীত্ব।

মনুষ্যমাত্রেরই ইচ্ছা যে রাজা হই, কিন্তু জগদীশ্বর সকলেরই সেই ইচ্ছা পূরণ করিয়া দিতেছেন। সংসার এক একটী ক্ষুদ্ররাজ্য স্বরূপ, এবং সংসারের কর্ত্তা সেই রাজ্যের রাজা। সংসারের কর্ত্তা রাজ-ক্ষমতা লইয়া সংসার চালনা করেন। প্রত্যেকেই তাঁহার আজ্ঞাবহ। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, দাস, দাসী প্রভৃতি সকলেই সেই ন্যায্য আজ্ঞা পালন করেন। পুত্রকন্যাগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে—সময় হইলে আবার এক একটী পরিবাররাজ্যের রাজারাণী হন। রাজার দায়ীত্ব যেমন গুরুতর, সংসারের কর্ত্তার দায়ীত্বও সেইমত গুরুতর। যে সংসারী সেই দায়ীত্বপালন করেন, তিনিই সুখী, তাঁহার সংসারও সুখী-পরিবার রূপে গণ্য। যে গৃহী পারিবারিক দায়ীত্বপালনে পরাঙ্মুখ, তাঁহার সেই সংসাররাজ্যে চির-দিনই অশান্তি এবং বিদ্রোহিতা দেখা যায়। যে গৃহী ধার্ম্মিক, নীতিশীল, উদারচেতা, পরোপকারী, মিষ্টভাষী এবং শিক্ষিত, তাঁহার পুত্রকন্যাগণও প্রায় সেইমত হয়েন। কর্ত্তার চরিত্র যেরূপ হইবে, সংসারের অন্যান্য সকলের চরিত্রও সেই-মত গঠিত হয়। মনুষ্যের শিক্ষা কেবল বিদ্যালয়ে হয় না,

আলয়েই আগে হয়। অতএব পরিবার প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকন্যাদিগকে নীতিশিক্ষা দান গৃহীগৃহিণী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তাহাই পারিবারিক দায়ীত্বের প্রধান ধারা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে বর্ত্তমান বাঙ্গালী পিতামাতা, পুত্রকন্যাদিগের সেই নৈতিক চরিত্র সংগঠনে বড়ই উদাসীন।

সংসারের কর্ত্তা গৃহিণী হইতে ভৃত্য এবং পরিচারিকা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট দায়ীত্ব আছে। প্রথম কথা—উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির পক্ষেই সংসার করা কর্ত্তব্য, যাহার উপার্জ্জনশক্তি নাই—সাংসারিক দায়ীত্বপালনের শক্তি নাই, তাহার পক্ষে সংসার গলগ্রহস্বরূপ—মৃত্যুস্বরূপ। সংসারির পক্ষে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতিকে পালন করা কর্ত্তব্য। পরিবারের প্রত্যেকের শারীরিক, মানসিক, এবং নৈতিক উৎকর্ষসাধনের প্রতি তাঁহার তীব্রদৃষ্টিদান বিধেয়। গৃহিণীর পক্ষে সংসারের আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে তত্বাবধানসহ কন্যাগুলির চরিত্র সংগঠন করা কর্ত্তব্য। কেবল পিয়ানো বাজাইয়া, উল বুনিয়া, নাটক নবেল পড়িয়া দিন কাটাইলেই গৃহিণীর কর্ত্তব্য কাজ হয় না। মা যেমন হয়, মেয়েও সেইমত আদর্শে স্বীয় চরিত্র গঠন করে। পুত্র কন্যার পক্ষে পিতামাতার প্রতি যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ সহ তাঁহাদিগের প্রত্যেক ন্যায়সঙ্গত আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। পুত্রকন্যা, পিতামাতার কোন অন্যায় আজ্ঞাই পালন করিতে বাধ্য নহে। পুত্র শিক্ষিত এবং উপার্জ্জনক্ষম হইলে, বৃদ্ধ

পিতামাতাকে পালন করিতে ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট। বাপকে বাগানেব মালী বলিয়া পরিচব দিতে বা মাকে গুদামভাডা দিইতে ঈশ্বব আদেশ করেন নাই। বডই দুঃখেব বিষয়, যে আজকাল অনেক নামজাদা শিক্ষিত লোক, বাপকে বাগানেব মালী সাজাইতে এবং মাকে গুদামভাডা দিতে লজ্জিত হয়েন না।

এখন আমাদিগেব দেশে পাবিপারিক বিপ্লব উপস্থিত। একান্নভুক্ত পবিবাব প্রথাটা এখনকাব কালেব উপযোগী নহে, শিক্ষিতগণ ইহাই ঠিক কবিয়া, একটু মাথাঝাডা দিয়া উঠি বাই—দুপয়সা আনিতে শিখিয়াই মা বাপ ভাই ভগ্নিদেব ফেলিয়া, আপনি আব পত্নি লইয়া, ইংবাজেব আদশে স্বতন্ত্র হইতে চাহেন। হউন, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু মা বাপ ভাই ভগ্নির নিকট তাঁহাদিগেব যে দায়ীত্ব আছে, সে দায়ীত্ব-পালন না কবিবেন কেন? কেবল প্রিয়তমা পত্নিব জন্য কডি বুডি গহনা গডাইবাব ব্যাঘাত হয বলিয়া, পিতামাতা প্রভৃতিকে ত্যাগ কবিযা, একান্নভুক্ত সংসাব প্রথাব মস্তকে পদাঘাত কবা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

সামাজিক দায়ীত্ব।

মনুষ্যমাত্রেই সমাজপ্রিয়। একত্রবাস মনুষ্যজাতিব প্রকৃতি। মনুষ্যজাতি কবে, কিরূপে সমাজ সংঠন করিতে শিখিয়াছে, তাহাব মূল ইতিবৃত্তটী অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আমবা বাজবিধি

এবং সামাজিক বিধি এই দুইটীর নাম শুনিতে পাই। কিন্তু মূলতঃ দুইটীর উদ্দেশ্য এক—দুইটীই এক জিনিস লইয়া সৃষ্ট। কোন একজাতি যতই শিক্ষাজ্ঞানবলে উন্নীত হয়, ততই সেই জাতির সামাজিক এবং রাজবিধি এক হইয়া যায়। ততই সেই জাতির মধ্যে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা বিদূরিত হইয়া—রাজশাসন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া, জাতিগত স্বায়ত্বশাসন প্রচলিত হইতে থাকে, এবং জাতির হস্তে সামাজিক ও রাজকীয় উভয় বিধি সৃষ্ট এবং রক্ষার ভার অর্পিত হয়। তখন জাতি নিজে রাজা হইয়া, আপনাকে আপনি শাসন এবং রক্ষা করিতে থাকে। তখন উচ্চপদস্থ ধনবান হইতে নিম্নপদস্থ কৃষক পর্য্যন্তের হস্তে রাজশাসনশক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে। আজকাল ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান জাতির প্রতি দৃষ্টিদান করিলে, ইহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেখানে সামাজিক এবং রাজকীয় বিধি বিভিন্ন হস্তে অর্পিত, সেখানে দুইটী স্বতন্ত্র বিভিন্নরূপে গণ্য। আমাদিগের দেশে তাহাই দেখা যায়।

সামাজিক দায়ীত্ব দ্বিবিধ—সহজ এবং গুরুতর। আচার ব্যবহার, বিবাহ, আহার, বেশভূষা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিধিগুলি জাতিবিশেষে—সমাজবিশেষে বিভিন্ন। সেগুলি মান্য করিয়া চলাই সহজ দায়ীত্ব। দ্বিতীয়—সমগ্র মানবসমাজ লইয়া কতকগুলি সার্ব্বভৌমিক গুরুতর দায়ীত্ব আছে। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ, সকলের মধ্যে একতা

বিস্তার, ভ্রাতৃভাব বিস্তার, সাম্য বিস্তার, পরস্পরের উপকার প্রত্যুপকার সাধন প্রভৃতি গুলিই গুরুতর দায়ীত্ব। যে সমাজের সমধিক লোক সেই গুরুতর দায়ীত্ব পালন করে, সেই সমাজ, সেই জাতিকে উন্নতির উচ্চতর আসনে সমাসীন করিয়া দেয়, এবং যে সমাজে সেই দায়ীত্বপালনের অভাব, সেই সমাজ অবনতি-পঙ্কে প্রোথিত হইয়া যায়। সামাজিক নিয়ম, সামাজিক বিধি ব্যবস্থা, এবং সামাজিক শাসনশক্তির উৎকৃষ্টাপকৃষ্টভাব উপর জাতিগত শক্তির দুর্ব্বলতা এবং দৃঢ়তা নির্ভর করে। যে জাতির সমাজ যে ভাবে গঠিত,সে জাতি সেই ভাবেই উন্নত বা অবনতি প্রাপ্ত হয়।

জাতির প্রত্যেক মনুষ্যকে লইয়াই সমাজ গঠিত, সুতরাং সমাজের শাসনশক্তি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির হস্তেই অর্পিত। যেমন প্রত্যেকের হস্তে শক্তি অর্পিত, সেইমত প্রত্যেকেরই সমাজের দায়ীত্বপালন করিতে বাধ্য। যে মানব সেই দায়ীত্বপালন করে না, সে সমাজশত্রু—দেশের শত্রুরূপে অবশ্যই সমাজ দ্বারা দণ্ডিত হয়।

সামাজিক সাধারণ রীতি নীতি বিধি ব্যবস্থাগুলি জাতিগত অবস্থা এবং দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার উপযোগীরূপে সর্ব্বত্র গঠিত, সংস্কৃত এবং পরিবর্ত্তিত হয়। সেইজন্যই এক জাতির কোন সামাজিক নিয়ম প্রণালী অন্যজাতির চক্ষে বিসদৃশ—কুসংস্কার বলিয়া বোধ হয়। সেইজন্যই একজাতির সমাজের কোন একটী বিধি—কোন একটী কার্য্য, পাপ বা অন্যায়

বলিয়া গণ্য থাকিলেও অন্য জাতি সেই বিধিপালন পাপ বা অন্যায় জ্ঞান করে না। আমাদিগেব দেশে ভাদ্রবধূকে স্পর্শ কবিলেই মহাপাপ। ভাসুর ঠাকুরকে মাথা মুড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কিন্তু ডিউক অব এডিনবর্গ, সেণ্টপিটার্সবর্গে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলেন। লণ্ডনেব প্রধান রেলওয়ে ষ্টেসনে ভাবতেশ্বরী অপবাপব পুত্রকন্যাগুলিকে লইয়া, নববধূকে ববণ করিয়া লইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নববধূ বেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র শাশুড়ী ঠাকুরাণী আদরে বধূকে গ্রহণ করিলে পর ভাসুর মহাশয় প্রিন্স অব ওএলস অগ্রসব হইয়া, নবভাদ্রবধূব মুখচুম্বন করিলেন। আমাদের দেশে হইলে, প্রিন্স অব ওএলসের ধোবা নাপিত এবং হুকা বন্ধ হইত, এবং তিনি একঘরে হইতেন তাহাব সন্দেহ নাই। এখানে আমরা যেটাকে পাপ বলি—অন্যায বলি, ইংবাজ সেটা পাপ বা অন্যায় বলে না। কিন্তু আবার আমরা মনে কবিলেই শ্যালীকে বিবাহ করিতে পারি। শ্যালীকে বিবাহ কবা আমাদেব সমাজের মতে অন্যায় বা পাপ নহে। কিন্তু ইংরাজসমাজে শ্যালীকে বিবাহ কবা অন্যায় বলিয়া বিধি আছে। ইংরাজজাতিব অনেকেই এত চেষ্টা কবিয়াও আজ পর্য্যন্ত পার্লিয়ামেণ্ট হইতে শ্যালীকে বিবাহ কবিবার বিধি প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন নাই। এখানে ইংবাজ যেটাকে অন্যায় বলে, আমবা সেটাকে অন্যায় বলি না।

কিন্তু সামাজিক আচাব ব্যবহার আহাব পরিচ্ছদ বিবাহ

প্রভৃতি বিধি ব্যবস্থা সকলকালেই সমান বলবৎ থাকিতে পারে না। জাতিগত অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সময়ের উপযোগীরূপে প্রাচীন বিধিগুলি পরিবর্ত্তিত এবং সংস্কৃত হইয়া নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে। এই জন্যই কোন এক সমাজেব একটী বিধি এক সময়ে বিশেষ উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় বোধ হইলেও জাতিগত অবস্থার পবিবর্ত্তনে সেই গুলিই আবার অপ্রয়োজনীয় এবং কুসংস্কার বলিযা গণ্য হয়। সমাজ সংস্কার কোন ব্যক্তি বিশেষেব ইচ্ছায়—বাজবিধির দ্বারা একদিনে হইবার নহে। সময় নিজে সমাজের উপযোগী সংস্কার কবিয়া থাকে।

এখন আমাদেব দেশে সমাজবিপ্লব উপস্থিত। বাঙ্গালীজাতি এখন নবজীবন পাইয়া, নবভাবে গঠিত হইতে চলিল, সুতবাং বাঙ্গালীজাতির অবস্থা পরিবর্ত্তনেব সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থার উপযোগী সামাজিক বিধি ব্যবস্থাগুলি সময় নিজে প্রস্তুত করিয়া দিতে উদ্যোগী হইতেছে। এখন প্রাচীনেবা সামাজিক বিধি ব্যবস্থার অবমাননা দেখিয়া—তিবোধান দেখিয়া, মাথায় হাত দিয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছেন, আবাব নব্যেবা সেই পুরাতন ব্যবস্থার স্থানে নবীন ব্যবস্থা বসাইবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু সকল প্রাচীন বিধি ব্যবস্থাই একেবাবে যাইবে না, আব সকল নূতন ব্যবস্থাই চিরদিনের জন্ত সমাজে স্থান পাইবে না। কোন্‌গুলি থাকিবে, কোন্‌গুলি যাইবে, সময় নিজে তাহা স্থির কবিয়া

দিবে। তখন আর প্রাচীনে নবীনে হাতাহাতি দেখা যাইবে না।

আমাদিগের সমাজরূপ উদ্যানটী অতীব প্রাচীন, কিন্তু প্রকৃতি, সময় এবং রুচি বলিতেছে, যে উদ্যান সংস্কার প্রয়োজন। সেই প্রকৃতি, সময় এবং রুচি সেই সংস্কারে প্রস্তুত হইতেছে। সমাজের চারিদিকের বেড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, শাস্ত্রিরূপ সরোবরটী শুখাইয়া যাইতেছে, সমাজের গৌরবরূপ ক্রীড়াপর্ব্বতটী চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সামাজিক বিধিরূপ পাদপগুলি সাময়িক গ্রীষ্মে পত্রশূন্য এবং সাময়িক রুচিরূপ ঝড়ে গোড়াসুদ্ধ উপড়াইয়া পড়িয়াছে। সমাজটা এখন পোড়ো জমিতে পরিণত হইতেছে।, সমাজ নেতারূপ মালী গতিক দেখিয়া ভাগিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের আর বিলম্ব সহে না, আমরা অধীর হইয়া পড়িতেছি। প্রকৃতি এবং সময় বড় ধীরগতিতে কাজ করিতেছে দেখিয়া, আমরা রাতারাতি উদ্যানটী প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য গবর্মেণ্টরূপ বার্ণ কোম্পানিকে কণ্ট্রাক্ট দিতে চাহিতেছি। রাজকীয় বিধিরূপ বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট একদিনে এই সমাজরূপ উদ্যান সংস্কার করিয়া দিউন, ইহাই আমাদিগের মধ্যে অনেকের ইচ্ছা।

আবার অনেকে নিজেই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতেছেন। অনেকে উদ্যানে মধুরগন্ধপূর্ণ বেল জুঁই গোলাপ বৃক্ষগুলি উপড়াইয়া ফেলিয়া,

বিলাতী সামাজিক বিধিরূপ বিলাতী গন্ধশূন্য ফুলের গাছ গাছড়া আনিয়া সমাজবাগানে বসাইতে উদ্যত। কেহ কেহ বা ভিক্টোরিয়া পদ্ম, ক্রোটন প্রভৃতি বিলাতী ভাল ভাল গাছেরও আমদানী করিতেছেন। আবার অনেক নির্ব্বোধ, গোবর আবর্জ্জনা প্রভৃতি যেখানে যাহা পাইতেছে, তাহা আনিয়া এই পোড়ো সমাজ জমিতে ফেলিতেছে। তাহারা বিলাতী রুচিরূপ ড্রেণের সাহায্যে এইগুলা আনিয়া সমাজ জমিকে স'ট্‌ওয়াটার লেকে পরিণত করিতে চাহিতেছে। দুর্গন্ধে আমাদের প্রাণ যায়। আবার সমাজের যে সকল বিধিরূপ পাদপ পচিয়া ধসিয়া দুর্গন্ধ বাড়াইতেছে, অনেকে সেগুলিকে কোন মতেই ছাড়িতে চাহিতেছে না—সেগুলি ভাল ভাল বলিয়া, সেগুলিকে লইয়া মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু এসব কাণ্ডকারখানা দেখিয়া প্রকৃতি আর সময় হাসিতেছে। তাহারা এখন ভাঙ্গিতেই নিযুক্ত, এখনও গড়িতে আরম্ভ করে নাই। যখন গড়িবে, যেটী রাখিবার সেইটী রাখিয়া, বাকি সব ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিবে।

স্বত্ব এবং জাতিগত দায়ীত্ব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সামাজিক এবং জাতিগত দায়ীত্ব এক। কিন্তু আমাদিগের জাতিগত দায়ীত্ব, স্বত্ব, স্বাধীনতা, এবং অধিকারের অবস্থা না কি এক্ষণে বড়ই শোচনীয়, সেগুলি নাকি একেবারে বিলুপ্ত প্রায়, আমাদিগের সামাজিক-

স্বত্ব, স্বাধীনতা, অধিকার হইতে জাতিগত স্বত্ব, স্বাধীনতা, অধিকার নাকি বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, কতকগুলি নাকি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কতকগুলির নূতন প্রতিষ্ঠা হইতেছে, এবং অনেকগুলির নাকি নূতন প্রতিষ্ঠার—নূতন সংগ্রহের প্রয়োজন, সেইজন্য এস্থলে জাতিগত দায়ীত্ব, স্বত্ব, স্বাধীনতা এবং অধিকার সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলার আবশ্যক।

হস্ত পদ নাসিকা প্রভৃতি লইয়া যেমন শরীর গঠিত, সেই-মত সম্ভ্রান্ত ধনবান—মহান পণ্ডিত হইতে পথের ভিখারী এবং নিরক্ষর কৃষক পর্য্যন্তকে লইয়া জাতি গঠিত। যেমন হস্তপদাদির মধ্যে কোন একটী অঙ্গ পীড়িত হইলে, সকল অঙ্গই অসুখ বোধ করে, সেইমত জাতির যে কোন শ্রেণীর কোন একটী মনুষ্য উৎপীড়িত হইলে সমগ্র জাতির পক্ষে উৎপীড়িত বোধ হওয়া কর্ত্তব্য। সকলকে লইয়াই জাতির গঠন, সকলেরই জাতি-গত সমান স্বত্ব আছে, এবং সকলের উপরই জাতিগত দায়ীত্ব-পালনভার সমভাবে অর্পিত। মনুষ্যের শারীরিক, মানসিক বা আর্থিক অবস্থা যতই কেন বিভিন্ন হউক না, যতই কেন তারতম্য থাকুক না, ন্যায়ের চক্ষে সকলেরই স্বত্ব, স্বাধীনতা সমান। ন্যায়ের চক্ষে রাজা প্রজা নাই—শাসা শাসক নাই। মিল বলেন, প্রত্যেক মনুষ্যই স্বাধীনভাবে চিন্তা, স্বাধীনভাবে মতবাদ প্রকাশ, এবং স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে ক্ষমবান। যতক্ষণ না সেই চিন্তা, মতবাদ এবং কার্য্য, সমাজ বা জাতির

কোন অনিষ্ট করিতেছে, ততক্ষণ সমাজ বা জাতি তাহার কোন বাধা দান করিবার অধিকারী নহে। যাহা সমাজের অনিষ্টকারী, সমাজ বা জাতি তাহাই নিবারণ করিতে পারে। মিলের একথাগুলি অমূল্য। ইহাই মনুষ্যের স্বত্বসনন্দ—চার্টার। জগদীশ্বর এই সনন্দ আমাদিগকে দিয়াছেন। এই সনন্দ যে ব্যক্তি লোপ করিতে চাহে, সেই-ই জাতির শত্রু। সেই শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে আমরা এই বিধিদত্ত সনন্দ বলে ন্যায়মত স্বত্ববান। সমাজশাসন-দণ্ড যেমন প্রত্যেক মনুষ্যের হস্তে অর্পিত, জাতিগত স্বায়ত্বশাসনের ভার সেইমত জাতির প্রত্যেকের হস্তে অর্পিত। তবে প্রত্যেকের পক্ষে একত্র সমাবদ্ধ হইয়া শাসনকার্য্য সমাধা করা অসম্ভব। অপর প্রত্যেকের নৈতিক, মানসিক এবং জ্ঞানবল সমান নহে বলিয়াই যাঁহারা সেই বলে বলীয়ান, তাঁহাদিগকেই জাতির নেতাস্বরূপে মান্য করিয়া, তাঁহাদিগের হস্তেই শাসনকার্য্য পরিচালনার ভার দেওয়া বিহিত। সভ্যজগতে তাহাই হইতেছে। সেই নেতাগণ—সেই প্রতিনিধিগণ জাতিসাধারণের মতবাদানুসারেই শাসনকার্য্য করিতে বাধ্য। সুতরাং সংখ্যাবদ্ধ প্রতিনিধির হস্তে শাসনভার থাকিলেও মূলতঃ জাতিই সেস্থলে জাতিকে শাসন করে। ইহারই নাম প্রকৃত স্বায়ত্ব-শাসন, প্রকৃত জাতিগত স্বত্ব লাভ এবং জাতিগত স্বাধীনতার অমিয়ময় ফলভোগ।

বিখ্যাত ফরাসী নীতিজ্ঞ রোবস্‌পিয়ার, জাতিগত স্বত্ব,

স্বাধীনতা, অধিকাব এবং দায়ীত্ব সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তিনি নিজে স্বদেশে সেই মন্তব্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন নাই বটে, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার জন্মভূমিতে সেই মন্তব্যের অধিকাংশই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। রোবস্‌পিয়াবেব ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্য্য যতই কেন বিয়োগান্ত এবং রক্তাক্ত বলিয়া অন্য জাতিব চক্ষে দৃষ্ট হউক না, কিন্তু তাঁহাব এই মন্তব্যগুলি অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হব।

তাঁহাব প্রথম বিধি—প্রত্যেক মনুষ্যের স্বভাবদত্ত স্বত্বরক্ষা এবং তাঁহার প্রত্যেক সদ্‌গুণের স্ফূর্ত্তি এবং বিস্তৃতির সহায়তা সাধন করাই প্রত্যেক রাজনৈতিক সভাব মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিধি—যাহার দ্বারা স্বীয় জীবন এবং স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়,তাহাই মনুষ্যের প্রধান স্বত্ব। তৃতীয—একটী জাতির সমস্ত লোকের মধ্যে পরস্পরের নৈতিক এবং শারীরিক বলের যতই কেন বিভিন্নতা এবং তারতম্য থাকুক না, সেই প্রধান স্বত্বটী সকল মনুষ্যেরই সমভাবে আছে। ধনবান, বিদ্বান্‌ এবং বলবানের ন্যায দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং মূর্খও সেই প্রধান স্বত্বে স্বত্ববান। সমাজ এবং প্রকৃতি সেই স্বত্বের সমতা স্থাপন করিয়া দিয়াছে ; সেই স্বত্ববিনাশ করা দূরে থাকুক, পাশবিক অত্যাচার এবং স্বেচ্ছাচার সেই স্বত্বকে কাল্পনিকতায় পরিণত করে বলিয়া, সমাজ এবং প্রকৃতি সেই স্বেচ্ছাচার এবং অত্যাচারের হস্ত হইতে সেই স্বত্বকে রক্ষা করে। চতুর্থ—প্রত্যেক মনুষ্য স্বাধীনতারূপ শক্তির দ্বারা আপন ইচ্ছামত স্বীয় মান-

লিক সমস্ত বৃত্তি পরিচালনা করিতে অধিকারী। ন্যায়, সেই স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক, অপরের স্বত্ব এবং অধিকার সেই স্বাধীনতার সীমা নির্দ্ধারক, প্রকৃতি তাহার মৌলিক নীতি বিধায়ক, এবং আইন সেই স্বাধীনতার পক্ষসমর্থক। পঞ্চম—যাহা অনিষ্টসাধক, আইন তাহাই নিবারণ করিতে পারে, এবং যাহা সমাজের বা জাতির উপকারক তাহাই করিতে আজ্ঞা দিতে পারে। ষষ্ঠ—আইন অনুসারে প্রত্যেক অধিবাসী যে সম্পত্তি সম্ভোগ করে,তাহারেই সম্পত্তির অধিকারিত্ব বুঝায়। সপ্তম—কোন প্রকার কাজকর্ম্ম প্রদান করিয়াই হউক, বা যাহারা শ্রমসাধ্য কাজকর্ম্ম করিতে অসমর্থ, তাহাদিগের জীবনধারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াই হউক, প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মপালনের জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে সমাজ অবশ্য বাধ্য। অষ্টম—অক্ষম ব্যক্তিদিগের যে সাহায্যের প্রয়োজন, সে সাহায্যটা কি? সেটা দরিদ্রদিগের নিকট হইতে গৃহীত ধনীদিগের ঋণস্বরূপ। সেই ঋণ কিরূপ প্রণালীতে পরিশোধ করা কর্ত্তব্য, আইন তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে। নবম—যে সকল অধিবাসীর কেবলমাত্র আত্মপালনের উপযোগী আয় আছে, তাহারা সাধারণ শাসনকার্য্যের ব্যয় দান হইতে নিষ্কৃতির পাত্র। অবশিষ্ট সকল লোক স্বীয় স্বীয় আয়ের উপযোগী স্বায়ত্তশাসন-ব্যয় দান করিতে বাধ্য। প্রজার কর দিবার ক্ষমতা না থাকিলে, সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট যেমন তাহার ঘটী বাটী ঘর দ্বার বেচিয়া

লয়েন, রোবস্পিয়ারেব মতে তাহা ন্যাযবিরুদ্ধ এবং অত্যাচার। দশম—জাতিসাধারণের জ্ঞানোন্নতি সাধন এবং যাহাতে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিতে পারে,. সমাজ স্বীয় সমস্ত শক্তি প্রয়োগে—প্রত্যেক উপায়ে সেই বিষয়ে সাহায্য করিতে বাধ্য। শিক্ষাই জাতিগত উন্নতির মূল। যে জাতি যত শিক্ষিত, সেই জাতির উন্নতি ততই উৎকর্ষতা পায়। রোবস্পিয়ারের মতে কেবল বড়লোকদিগের জন্য স্কুল কালেজ করিলে চলিবে না, জাতির প্রত্যেক লোককে বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে সমাজ বাধ্য। একাদশ—অধিবাসী সাধারণেই রাজা, শাসনই তাহাদিগের কার্য্য, শাসনই তাহাদিগের স্বত্ব এবং সাধারণ কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগের ভৃত্য। অধিবাসিরা আপনাদিগের আবশ্যক এবং ইচ্ছামত শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তন এবং যে কোন বিধান পরিবর্জ্জন করিতে পারে। দ্বাদশ—আইনের চক্ষে সকলেই সমান। ত্রয়োদশ—কেবল গুণ এবং বুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে পার্থক্য না করিয়া, প্রত্যেক অধিবাসীকেই জাতির শাসনকার্য্যের যে কোন পদেই নিযুক্ত করিতে সমাজ বাধ্য। অর্থাৎ যাহার কোন গুণ নাই-বুদ্ধি নাই, সে ছাড়া আর সকলেই যোগ্যতানুসারে শাসনকার্য্যের যে কোন পদে প্রবেশ করিতে অধিকারী। চতুর্দ্দশ—প্রত্যেক অধিবাসীই জাতিসাধারণের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন এবং আইন প্রণয়নকালে মতদান করিতে সমানরূপে অধিকারী। পঞ্চদশ—যাহাতে

অধিবাসী সাধারণের সেই স্বত্বগুলি কেবল নামমাত্র না হয়, এবং সেই স্বত্ব যাহাতে কেবল কল্পনায় পরিণত না হয়, তজ্জন্য জাতি, সাধারণ কর্ম্মচারিগণকে বেতন দান করিতে বাধ্য এবং যে সকল অধিবাসী কেবলমাত্র শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, প্রচলিত আইন, তাহাদিগকে জাতিসাধারণ সভায় উপস্থিত জন্য আহ্বান করিলে, যাহাতে তাহাদিগের নিজের এবং পরিবারের জীবিকাযাত্রার কোন ব্যাঘাত না ঘটে, এরূপ উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সমাজ বাধ্য। ষোড়শ—অত্যাচারীর অত্যাচার উৎপীড়ন নিবারণ করা অধিবাসী সাধারণের—মনুষ্যমাত্রের আর একটী স্বত্ব। জাতির কোন একটী লোক উৎপীড়িত হইলে, সমগ্র সমাজই উৎপীড়িত হয়। সপ্তদশ—সকল মনুষ্যই পরস্পরে ভ্রাতৃসম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ, সুতরাং জগতের বিভিন্নজাতি যেন সকলেই একটী দেশের অধিবাসী এমত জ্ঞান করিয়া, সকল জাতিরই পক্ষে পরস্পরের সাহায্য করা কর্ত্তব্য। অষ্টাদশ—যে ব্যক্তি জাতির প্রতি উৎপীড়ন করে, সেই জাতির শত্রু। উনবিংশ—ধনবান, স্বেচ্ছাচারী এবং অত্যাচারিগণ, জগতের অধীশ্বর মনুষ্যজাতির বিরুদ্ধে এবং বিশ্বের নিয়ামক প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী।"

যদিও রোবস্পিয়ারের এই বিধানগুলি সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হয় নাই, কিন্তু ফরাসীজাতি এই মূল বিধানানুযায়ী ব্যবহারলে আপনাদের জন্মভূমিতে আপনারা রাজত্ব করিতে-

ছেন। ফ্রান্সদেশের রাজা ফরাসীজাতি। ফরাসীজাতি আজি উক্ত প্রকার নির্দ্ধারিত ব্যক্তিগত, সমাজগত, জাতিগত স্বত্ব, স্বাধীনতা এবং অধিকার সংগ্রহ করিয়া, উক্ত বিধিমত দায়ীত্ব-পালন করিয়া, আপনারা জীবন্তে স্বর্গসুখভোগসহ জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। যে পতিত জাতি পুনবার জাতি নামে গণ্য হইতে অভিলাষী, সে জাতির পক্ষে এই বিধিগুলি— এই দায়ীত্ব স্মরণীয়।

জন্মভূমিগত দায়ীত্ব।

শেষ কথা—শেষ দায়ীত্ব—জন্মভূমির দায়ীত্ব। জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষা গরীয়সী, একথা আমরা পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু কথাটা তলিয়া বুঝি না কেন?— কারণ আমরা জন্মভূমির কুসন্তান। জননী দশমাস দশদিন জঠরে ধারণ করিয়া শৈশবে বাল্যে লালনপালন করেন। কিন্তু জন্মভূমি আমাদিগের সেই জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে মরণ পর্য্যন্ত সযতনে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, পালন করেন। মাতা অপেক্ষা জন্মভূমি শ্রেষ্ঠ, একথা আমরা বলিলে, বাঙ্গালীজাতি নাক সিঁটকাইবেন বটে, কিন্তু যাহাদিগের প্রকৃত জাতিত্ব আছে, তাহারা মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করে। জন্মভূমির ঋণ পরি-শোধ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব, কেবলমাত্র জন্মভূমির দায়ীত্ব পালন করিয়া, আমরা কতকটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি মাত্র। যে দেশে যাহার জন্ম, সে সেই দেশ—সেই জন্মভূমি

বিজাতীয় আক্রমণকারির হস্ত হইতে রক্ষা করিতে ঈশ্বরের বিধানানুসারে সর্ব্বাগ্রে বাধ্য—দায়ী। যে দিন হইতে মনুষ্যের জ্ঞান জন্মে, সেই দিন হইতেই মনুষ্য জন্মভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতে বাধ্য। প্রাণ আমার নিজের হইলেও এ প্রাণটী জন্মভূমির জন্য যখন প্রয়োজন হইবে, তখনই প্রদান করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিতে এবং সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে মনুষ্যমাত্রেই বাধ্য। প্রাণটী আমার নিজের, আর কাহারও নহে, কখনও মরিব না, এই ভাবটী কেবল পতিত জাতির হৃদয়েই স্থান পায়। জগতের প্রাচীন এবং আধুনিক প্রত্যেকজাতির প্রতি দৃষ্টি দাও—দেখিবে, সকলেরই ধুয়া—জন্মভূমির জন্য প্রাণ, জন্মভূমির জন্য দিব। যে কোন পতিত জাতি যতদিন না সেই জন্মভূমির জন্য প্রাণ বলিদান করিতে শিখে, ততদিন সে জাতি অবশ্যই জগতের প্রত্যেক জাতির নিম্নে পড়িয়া থাকিবে, পদপদে বিদলিত, নিগৃহীত এবং সর্ব্বস্বান্ত হইতে থাকিবে। জন্মভূমি রক্ষা করাই মনুষ্যের প্রধান দায়ীত্ব। প্রাণ দিয়া, মন দিয়া, ধন দিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা জন্মভূমির নিকট—ঈশ্বরের নিকট দায়ীত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছি। ঈশ্বরের এমত ইচ্ছা নহে, ন্যায়ের এমত আদেশ নহে, প্রকৃতির এমত নিয়ম নহে, যে জগতের কেবল দুই চারিটী জাতি পাশবিক বলে অন্যান্য জাতিকে শাসন করিবে, ক্রীতদাসের ন্যায় পদে পদে দলন করিবে, অন্যান্য দেশের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া আপনা-

দিগের জন্মভূমির ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকিবে। প্রত্যেক জাতিই এজগতে স্বাধীনভাবে থাকিয়া, জন্মভূমিকে স্বাধীন রাখিয়া, আপনাদিগকে আপনারা শাসন করিবে, ইহাই ন্যায়ের চূড়ান্ত বিধি।

বিজাতীয় বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে জাতিগত স্বাধীনতা—জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সেই বিজাতির পাশবিক বলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড পাশবিক বল প্রয়োগ করিতে প্রত্যেক জাতিই ন্যায়ের দ্বারা আদিষ্ট। আত্মস্বত্ব, আত্মজীবন এবং আত্মস্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রত্যেক মনুষ্য যেমন অপরের অত্যাচার উৎপীড়ন নিবারণ করিতে অধিকারী, সেইমত জন্মভূমির স্বত্ব, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আক্রান্ত জাতি যে কোন উপায়ে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে অধিকারী। ন্যায্যস্বত্ব–বিধিদত্তস্বত্ব রক্ষা এবং জাতিগত দায়ীত্বপালন জন্য ন্যায় এবং বিধি, নিজে পতিত জাতিকে বিপক্ষ রক্তে জননী জন্মভূমিকে স্নান করাইয়া, বিপক্ষ-মুণ্ডমালা গলে দোলাইয়া, বিপক্ষমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছে। সে যজ্ঞের ফল—জীবন্তে স্বর্গলাভ। সে যজ্ঞে অনভিলাষের ফল—জীবন্তে নরকবাস। যে জাতি শত শত বর্ষ হইতে পরাধীন, পরপদদলিত, পরপ্রত্যাশী, পরমুখাপেক্ষী, ক্রীতদাস, সে জাতি কখনই স্বাধীনদেশ—স্বাধীনজাতির জীবন্তে স্বর্গভোগের কল্পনা ভ্রমেও হৃদয়ে আনিতে পারে না, সে জাতির জাতিত্ব—মনুষ্যত্ব সকলই ঘুচিয়া যায়। সে জাতি তখন পশুর অপেক্ষাও অধম।

সে জাতি তখন জীবন্তে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে, সর্ব্বস্ব অন্যজাতিকে দিয়া, সেই অন্যজাতির দয়ার অধীনে থাকিয়া জন্মভূমির কুসন্তানরূপে জগতে পরিচিত হয়। সে জাতির জন্মভূমি তখন ক্রীতদাসীর ন্যায় জগতে বিক্রীত হয়। যে জাতির পাশবিক বল অধিক, সেই জাতিই তখন সেই ক্রীতদাসীর সর্ব্বনাশ করিতে থাকে।

তবে কি সেই পতিত জাতির—সেই ক্রীতদাসীস্বরূপিনী জন্মভূমির উদ্ধারের আর উপায় নাই? উপায় আছে। সে উপায়—জন্মভূমিগত দায়ীত্বপালন। উত্থান পতন, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রকৃতির অখণ্ডনীয় নিয়ম। যেমন শারীরিক, সামাজিক, জাতিগত এবং জন্মভূমিগত দায়ীত্ব বিস্মৃত হইলে, জাতিগত—জন্মভূমিগত পতন হয়, সেইমত আবার সেই পতিত জাতি যদি সেই দা[illegible] দ্বিগুণ উৎসাহে—দ্বিগুণ উদ্যমের সহিত—দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত উদ্যোগী হয়, তাহা হইলে স্বয়ং প্রকৃতি, স্বয়ং ন্যায়, স্বয়ং জগদীশ্বর সেই পতিত জাতির উদ্ধার জন্য অভয় হস্ত বিস্তার করিয়া দেন। জাতি জাতির দ্বারা জাতির বলে গঠিত হয়। পতিত জাতির পক্ষে জাতিগত—জন্মভূমিগত স্বাধীনতা সংগ্রহের কতকগুলি অস্ত্র প্রকৃতি স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেই অস্ত্রগুলি হারাইলেই জাতিগত পতন। সেগুলি কি?—স্বদেশানুরাগ, একতা, সাহস, উদ্দীপনা, শৌর্য্য, বীর্য্য, সৌহার্দ্দ, ভ্রাতৃভাব, সাম্য, প্রতিহিংসা, আত্মধিকার, স্বাবলম্বন, আত্মপ্রত্যয়,

আত্মনির্ভর,এবং কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি। এগুলি ব্রহ্মাস্ত্র—অব্যর্থ অস্ত্র। এই অস্ত্রগুলি যদি পতিত জাতি সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে সত্বরসমুত্থানের কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটে না, তাহা হইলে প্রকৃতি নিজে সেই জাতির জয়ভেরী বাজাইতে থাকেন, সময় নিজে সেই জাতিকে একজন মনুষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান করাইয়া তাহাদিগকে স্বর্গাভিমুখে লইয়া যায়, ভাগ্য নিজে সেই জাতির পক্ষাবলম্বন করিয়া, গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, এবং স্বয়ং জগদীশ্বর—সেই অজ্ঞাত অজ্ঞেয় মহান শক্তি, সেই জাতিকে সাদরে গ্রহণ জন্য স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেন। তখন স্বাধীনতা এবং শান্তি আসিয়া, সেই জাতি[illegible]বরণ করিয়া লয়। তখন সহস্র চন্দ্র উদিত হইয়া সেই জাতির শিরে স্বর্গীয় জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে থাকে। তখন পবন, গগনে গগনে—জন্মভূমির প্রতি প্রান্তে কীর্ত্তন করে—শান্তি—শান্তি—শান্তি।